জীবনযাত্রার মান (এপ্রিল-জুন ২০১২)

দূর্গম স্থানে বসবাসকারী চরম দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থা

জীবনযাত্রার মান বলতে সাধারণত জীবনযাপন পদ্ধতির অবস্থাকে বোঝানো হয় যা উন্নয়ন অন্বেষণের পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস, পর্যন্ত করা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। উন্নয়ন অন্বেষণের এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের তিনটি জেলায় (গাইবান্ধা, শরিয়াতপুর ও সিরাজগঞ্জ) বসবাসকারী চরম দারিদ্রের শিকার মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণতার কারণে এই তিনটি জেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে গবেষণার জন্য। একদিকে প্রতি বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হয় এবং অন্যদিকে শুষ্কমৌসুমে খরা হওয়ার কারণে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। শরিয়তপুরে পানি ও জমিতে লবণাক্ততার সমস্যাও অনেক বেশি। এই তিনটি জেলায় নদী ভাঙ্গণের মাত্রাও অনেক বেশি, যার ফলে দারিদ্রের প্রবণতা অনেক বেশি। নদীভাঙ্গনের ফলে ভূমির মালিকানা নির্ধারনও একটি বড় সমস্যা যা জীবনযাত্রায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষমতাশীল শ্রেণীর সাথে ক্ষমতাহীন শ্রেণীর মাঝে বিরোধ বজায় রাখে।

বর্তমান সময়ে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGOs) এই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অক্সফাম নোভিব এর আর্থায়নে গণ কল্যাণ সংস্থা (জিকেএস), গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ও শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, শরিয়তপুরে অবস্থিত তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই এলাকার চরম দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন অন্বেষন কৌশলগত সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উপোরক্ত তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, শরিয়তপুরের দুর্গম স্থানে বসবাসকারী চরম দারিদ্রের শিকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ‘অরক্ষিত বাস্তুতন্ত্রের জন্য পুনরুৎপাদকশীল কৃষি এবং টেকসই জীবনযাত্রা প্রকল্প (রিজলভ)’ নামক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের তত্তাবধানে মুলত দুইটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে- একটি হলো ‘জীবিকার বৈচিত্রায়ন’ এবং অপরটি হলো ‘ক্ষুদ্র উদ্দ্যোগ প্রসারণ’। এই গবেষণাপত্রে দুই শ্রেণীর পরিবারকে নেয়া হয়েছে, একটি শ্রেণী হলো যারা উপোরক্ত মডেলগুলোর কোন একটির সাথে সরাসরি জড়িত অর্থাৎ রিজলভ প্রকল্পের সাথে জড়িত (এই শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী বলা হয়েছে) এবং অপর শ্রেণী হলো যারা রিজলভ প্রকল্পের সাথে জড়িত নয় (এই শ্রেণীকে অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী বলা হয়েছে)। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে জিকেএস, জিইউকে, এসডিএস এর দ্বারা পরিচালিত মাসিক জড়িপের মাধ্যমে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের উপাদানের (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) উপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি নারীর অধিকার বিষয়ক তথ্য-উপাত্তও সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য মাসিক জরিপকৃত পরিবারের সংখ্যা হল মোট ৫১০টি- গাইবান্ধা জেলা থেকে নেয়া হয়েছে ১১০টি পরিবার যার মাঝে ৫৫টি পরিবার নিয়ন্ত্রিত ও ৫৫টি পরিবার অনিয়ন্ত্রিত; সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে নেয়া হয়েছে ২৫০টি পরিবার যার মাঝে ১২৫টি পরিবার নিয়ন্ত্রিত ও ১২৫টি পরিবার অনিয়ন্ত্রিত; শরিয়তপুর জেলা থেকে নেয়া হয়েছে ১৫০টি পরিবার যার মাঝে ৭৫টি পরিবার নিয়ন্ত্রিত ও ৭৫টি পরিবার অনিয়ন্ত্রিত। নির্বাচিত সব পরিবারের প্রতিদিনের গড় আয় ১.২৫ ডলারের কম যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত দারিদ্ররেখার মাপকাঠি।

এই প্রতিবেদনে মূলত চরম দরিদ্র মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি আলোচনার পরিবর্তে সময়ের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সাথে তুলনার পাশাপাশি বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ (২০১০) এর সূচকের সাথেও তুলনা দেখানো হবে। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ (২০১০) এর সূচকের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আয়

পেশাঃ উন্নয়ন অন্বেষণের এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনগুলোতে আয়ের ক্ষেত্রে আয়ের উৎস, আয়ের পরিমাণ, মাথাপিছু আয় ও দারিদ্রতার পরিমাণ বিষয়গুলোক দেখা হয়। এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, জড়িপে অংশগ্রহণকারীদের পেশায় গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল (কৃষক বা মজুরি শ্রমিক হিসেবে)। অধিকাংশ পরিবারের নিজস্ব কোন জমি নেই, যারা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কৃষিকাজ করছে তারা এই গবেষণায় কৃষক হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে যারা জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে তারা এই গবেষণায় মজুরি শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত। এই দু'টি প্রধান পেশা ছাড়াও অন্যান্য পেশা হলো জেলে,রিক্সা/ভ্যানচালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোট চাকুরিজীবি, রাজমিস্ত্রি, বাসের চালক বা হেলপার প্রভৃতি।

২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে (ভিত্তি ত্রৈমাসিক) জড়িপে অংশগ্রহণকারীদের ২১.৮৯ শতাংশ পরিবার প্রধানের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ, যা সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮.৬৮ শতাংশে। অপরদিকে প্রথম ত্রৈমাসিকে জড়িপে অংশগ্রহণকারীদের ৬১.৭৮ শতাংশ পরিবার প্রধানের মূল পেশা ছিল মজুরি শ্রমিক, যা সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩.৯২ শতাংশে। অন্যান্য পেশায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন না হলেও রিক্সা/ভ্যানচালকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে (৩.৭৮ শতাংশ ও ৫.৬২ শতাংশ যথাক্রমে প্রথম ও সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে)।

সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, শরিয়তপুরে নিয়ন্ত্রিত (৫৬ শতাংশ) ও অনিয়ন্ত্রিত (৩৮.৮৭ শতাংশ) উভয় গোষ্ঠীতে কৃষকের হার গাইবান্ধা (৩৩.২ শতাংশ ও ১৭.০৭ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে) ও সিরাজগঞ্জের (৫.৩৩ শতাংশ ও ২১.৬ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে) তুলনায় বেশি। অপরদিকে সিরাজগঞ্জে নিয়ন্ত্রিত (৭২.৫৩ শতাংশ) ও অনিয়ন্ত্রিত (৪৯.৪৭ শতাংশ) উভয় গোষ্ঠীতে মজুরি শ্রমিকের হার গাইবান্ধা (৫০.৫৩ শতাংশ ও ৫৪.৫৩ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে) ও শরিয়তপুরের (২৯.৩ শতাংশ ও ৫৭.১৩ শতাংশ

যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে) তুলনায় বেশি। সর্বোপরি অন্যান্য পেশার তুলনায় তিনটি এলাকায় মজুরি শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

আয়ের পরিমাণঃ এই গবেষণায় দারিদ্রতাকে চারটি স্তরে ভাগ করে দেখা হয়েছে। যাদের গড় আয় মাসিক ০ থেকে ২০০০ টাকা (বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী গড় আয় প্রতিদিন ১ ডলারের কম) তারা চরম দরিদ্র; যাদের গড় আয় মাসিক ২০০০-৩০০০ টাকা (বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী গড় আয় প্রতিদিন ১.২৫ ডলারের কম) তারা দারিদ্র রেখায় অবস্থান করছে। যাদের আয় ৩০০০-৪০০০ টাকা তারা দারিদ্র রেখার কিছুটা উপরে অবস্থান করছে এবং যাদের আয় ৪০০০ টাকার উপরে তারা দরিদ্র নয়।

এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (২৮.৩৬ শতাংশ) মানুষ চরম দারিদ্রতায় জীবনযাপন করছে যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ছিল প্রায় ৬০.৮৯ শতাংশ। অপরদিকে, শতকরা প্রায় ৩২.৩৯ ভাগ মানুষ দারিদ্র রেখায় অবস্থান করছে যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ছিল শতকরা প্রায় ২১.৭৮ ভাগ। শতকরা প্রায় ২৫.০৭ ভাগ মানুষ দারিদ্র রেখার উপরে অবস্থান করছে যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ছিল শতকরা প্রায় ১৭.৩৩ ভাগ। ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, কোন মানুষেরই আয় ৪০০০ টাকার বেশি ছিল না সেখানে ২০১২ সালের এই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৪.১৯ শতাংশ লোকের আয় ৪০০০ টাকার বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উভয় গোষ্ঠীতে গড়ে আয় দারিদ্রতা কমছে।

ছক ১_ সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর আয়ের পরিমাণের শতকরা হার (এলাকাভিত্তিক)

আয়ের পরিমাণ	গাইবান্ধা		সিরাজগঞ্জ		শরিয়তপুর	
	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
<২০০০ টাকা	১৮.৮	২২.১৩	২২.১৩	১৮.৪	২৫.৩৩	৬৬.৩৩
২০০০-৩০০০ টাকা	৪০	৪১.২	২০.২৭	১৭.০৭	৩৯.৫৭	৩৬.২৩
৩০০০-৪০০০ টাকা	৩৪.২৭	৩৩.০৭	২৯.৬	৩৩.৬	১৯.৪৩	০.৪৩
৪০০০+ টাকা	৬.৯৩	৩.৬	২৮	৩০.৯৩	১৫.৬৭	০

এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে শরিয়তপুরে উভয় গোষ্ঠীতেই চরম দারিদ্রতার হার সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে দারিদ্র রেখায় অবস্থানকারীর হার অন্যান্য এলাকার তুলনায় গাইবান্ধায় বেশি। দারিদ্র রেখার উপরে অবস্থানকারীর হারও অন্যান্য এলাকার তুলনায় গাইবান্ধায় বেশি। সিরাজগঞ্জে জড়িপে অংশগ্রহণকারী নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ২৮ শতাংশ ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর ৩০.৯৩ শতাংশ পরিবারের মাসিক গড় আয় ৪০০০ টাকার উপরে যা গাইবান্ধা ও শরিয়তপুরের তুলনায় বেশি।

আয় দারিদ্রঃ বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব আনুযায়ী, একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের গড় আয় ১ ডলার হলে সেই ব্যক্তি নিম্ন দারিদ্র রেখায় ও একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের গড় আয় ১.২৫ ডলার হলে সেই ব্যক্তি উচ্চ দারিদ্র রেখায় অবস্থান করে। এই গবেষোণায় দেখা যাচ্ছে যে, গত এক বছরে জড়িপকৃত পরিবারগুলোর উচ্চ দারিদ্রের হার কমেছে (২০১১ সালের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে এবং ২০১২ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৮২.৬৭, ৭৯.৫৫, ৮২.৮৯, ৭৩.৬১ ও ৬০.৭৫ শতাংশ) যদিও বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ,২০১০ এর (৩৫.২ শতাংশ) সূচকের তুলনায় এই হার অনেক বেশি। অপরদিকে গত এক বছরে জড়িপকৃত পরিবারগুলোর নিম্ন দারিদ্রের হারও ক্রমান্বয়ে কমেছে (২০১১ সালের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে এবং ২০১২ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৬০.৮৯, ৫৩.৩৩, ৪৭, ৩৫.৯ ও ২৮.৩৬ শতাংশ) যা বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ,২০১০ এর (২১.১ শতাংশ) সূচকের তুলনায় এই হার এখনও কিছুটা বেশি।

এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে শরিয়তপুরে উভয় গোষ্ঠীতেই নিম্ন দারিদ্রতার হার অন্য এলাকার তুলনায় বেশি। গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরে জড়িপকৃত নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর উচ্চ দারিদ্রতার হার যথাক্রমে ৫৮.৮ শতাংশ, ৪২.৪ শতাংশ ও ৬৪.৯ শতাংশ। অপরদিকে গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরে জড়িপকৃত অনিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর উচ্চ দারিদ্রতার হার যথাক্রমে ৬৩.৩৩ শতাংশ, ৩৫.৪৭ শতাংশ ও ৯৯.৫৬ শতাংশ। পাশাপাশি গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরে জড়িপকৃত নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর নিম্ন দারিদ্রতার হার যথাক্রমে ১৮.৮ শতাংশ, ২২.১৩ শতাংশ ও ২৫.৩৩ শতাংশ এবং অনিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর নিম্ন দারিদ্রতার হার যথাক্রমে ২২.১৩ শতাংশ, ১৮.৪ শতাংশ ও ৬৬.৩৩ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র সিরাজগঞ্জে নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্রতার হার অনিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর তুলনায় বেশি।

ব্যয়

জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ৬টি উপাদানের ব্যয়কে এই প্রতিবেদনে বিবেচনা করা হয়েছে। এই উপাদানগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যয়বহুল খরচ। এছাড়াও পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগও হিসাব করা হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মোট ব্যয়ের সিংহভাগ হয় খাদ্য, বস্ত্র ও ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য। এর মাঝে খাদ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়। জড়িপে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলো তাদের আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩০.১৩ শতাংশ) ব্যয় করে শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে ছিল ৩৫.৭৫ শতাংশ। শুধুমাত্র ব্যয়বহুল খরচ বাদে (০.২৩ শতাংশ ও ০.৩৮ শতাংশ যথাক্রমে ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে ও সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে) সকল খরচ ২০১১ সালের তুলনায় এই সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়েছে। প্রথম ত্রৈমাসিকে বস্ত্র (৮.৩২ শতাংশ), বাসস্থান (৩.০৭ শতাংশ), শিক্ষা (৬.১৬ শতাংশ), চিকিৎসা (৪.৭১ শতাংশ)ও পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ (১৫.৮৪ শতাংশ) এর জন্য যে ব্যয় হত তা এই সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে বস্ত্র (৭.০৯ শতাংশ), বাসস্থান (১.৭১ শতাংশ), শিক্ষা (৩.৬৭ শতাংশ), চিকিৎসা (৩.৯০ শতাংশ) ও পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ (৪.৫৩ শতাংশ)।

বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ (২০১০) এর সূচকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ দরিদ্র লোকেরা তাদের ব্যয়ের প্রায় ৭.২৭ ভাগ ব্যয় করে বাসস্থানের জন্য কিন্তু উন্নয়ন অন্বেষণের এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ১.৭১ শতাংশ ব্যয় হয় বাসস্থানের জন্য। অপরদিকে এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ০.৩৮ শতাংশ ব্যয় করা হয় ব্যয়বহুল খরচ (যেমন মোবাইল, ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি দামি পণ্যসামগ্রীর জন্য ব্যয়) এর জন্য কিন্তু বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ (২০১০) এর সূচকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ দরিদ্র লোকেরা তাদের ব্যয়ের প্রায় ১২.৬১ ভাগ ব্যয় করে ব্যয়বহুল খরচের জন্য। এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে আরো দেখা যাচ্ছে যে, মোট ব্যয়ের ৪.৫৩ শতাংশ করা হয় পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগে। এই ধরনের বিনিয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ছোট মুদির দোকানে বিনিয়োগ, শাক-সবজি চাষ, গবাদি পশু পালন বা সুদের বিনিময়ে অপরকে টাকা ধার দেয়া। এই ধরনের বিনিয়োগ থেকে ভাল লাভ হয় বলে জানিয়েছে পরিবারগুলো কিন্তু এই ধরনের কোন হিসাব বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপে নেই। এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর মাঝে ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য দেখা যায়নি।

খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

ভাত ও শাক-সবজী এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য। অন্যান্য খাদ্য যেমন- ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, ভোজ্যতৈল, ফলমূল গ্রহণের পরিমাণ খুবই কম। একটি সুষম খাদ্য তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি ও ভিটামিন সঠিক পরিমাণে থাকা প্রয়োজন যা উপোরক্ত খাদ্যগুলো সঠিক পরিমাণে গ্রহণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। গড়ে প্রতিদিন মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ থেকে মোট খাদ্য ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ হিসাব করা হয়। খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় হিসাব (২০১০) থেকে জানা যায় যে, একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন ≤২১২২ কিলোক্যালরি, ≤১৮০৫ কিলোক্যালরি ও ≤১৬০০ কিলোক্যালরি গ্রহণ করলে যথাক্রমে absolute, Hardcore and ultra poor বলা হয়; এবং ২১২২ কিলোক্যালরির বেশি গ্রহণ করা হলে দারিদ্ররেখার উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ দরিদ্র নয়।

২০১২ সালের এই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রামীণ জনগোষ্টীর গড়ে প্রতিদিন মোট ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ২৩৩৩.১৭ কিলোক্যালরী যা ২০১১ সালের প্রথম প্রতিবেদনে ছিল প্রায় ২১৩৭ কিলোক্যালরী এবং বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জড়িপ (২০১০) এর সূচকে ছিল প্রায় ২০৮৪.৬৪ কিলোক্যালরী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে খাদ্য গ্রহণের দিক থেকে গড়ে এই গ্রামীণ জনগোষ্টী দারিদ্ররেখার উপরে অবস্থান করছে।

এলাকাভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেখানো হলঃ

ছক ২_ সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ (এলাকাভিত্তিক)

	গাইবান্ধা		সিরাজগঞ্জ		শরিয়তপুর	
	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
কিলোক্যালরি	১৯১১	১৯৬৩.৩৩	২০৭৯.৬৭	২২৫২	৩৩৫১	২৪৪২

এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, শরিয়তপুরে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় গোষ্ঠীর গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের তুলনায় বেশি। শরিয়তপুরে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি পরিমাণে কিলোক্যালরি গ্রহণ করছে। অপরদিকে গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি পরিমাণে কিলোক্যালরি গ্রহণ করছে।

সামাজিকভাবে নারী পুরুষের উপর আরোপিত বৈষম্য

- এই গবেষণায় নিম্মোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি মূলত আলোকপাত করা হয়েছে;
- নারী শিক্ষার শতকরা হার
- নারীর উচ্চশিক্ষার শতকরা হার (এস.এস.সি বা উর্দ্ধে)
- নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার শতকরা হার (বিশেষত উপার্জনকারী নারীর ক্ষেত্রে)
- জন্মনিয়ন্ত্রন পধতি গ্রহণের শতকরা হার

২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে নারী শিক্ষার গড় শতকরা হার ছিল ২৭.১১ ভাগ সেখানে ২০১২ সালের এই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নারী শিক্ষার শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৮.৬৭ শতাংশ। গাইবান্ধায় নারী শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি (৪৪.৯৩ শতাংশ ও ৩৪ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর)।

জরিপকৃত এলাকাগুলোতে নারীর উচ্চ শিক্ষার হার খুবই কম। ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে গড়ে নারীর উচ্চ শিক্ষার হার ছিল মাত্র ০.৬৭ শতাংশ যা এই ত্রৈমাসিকে হয়েছে মাত্র ০.৮২ শতাংশ। এই ত্রৈমাসিকে সিরাজগঞ্জে এই হার সবচেয়ে বেশি (৩.২ শতাংশ ও ০.৮ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর) এবং শরিয়তপুরে কোন নারী উচ্চ শিক্ষিত নয়।জরিপকৃত এলাকাগুলোতে অধিকাংশ মেয়ের ১৪ থেকে ১৬ বছরের মাঝে বিয়ে হয়ে যায়। মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া বৃদ্ধি পেলেও বাল্য বিবাহের কারনে ও পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধির ফলে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর পর ঝরে পরার হার অনেক বেশি।

২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার শতকরা হার (বিশেষত উপার্জনকারী নারীর ক্ষেত্রে) ছিল প্রায় ২২.৫৬ শতাংশ যা ২০১২ সালের এই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কমে হয়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার শতকরা হার (বিশেষত উপার্জনকারী নারীর ক্ষেত্রে) সিরাজগঞ্জে সবচেয়ে বেশি (২৮.৮ শতাংশ ও ২০.৮ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর)।

২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে নারীর জন্মনিয়ন্ত্রন পধতি গ্রহণের শতকরা গড় হার ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ যা ২০১২ সালের এই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বেড়ে হয়েছে ৮৪.৯৬ শতাংশ। শরিয়তপুরে নারীর জন্মনিয়ন্ত্রন পধতি গ্রহণের শতকরা গড় হার ১০০ ভাগ যা গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের তুলনায় বেশি।

পরিশিষ্টঃ এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপকৃত এলাকার মানুষের প্রধান পেশা হলো মজুরি শ্রম এবং কৃষিকাজ। জমির সল্পতা ও নদীভাঙ্গনের ফলে অধিকাংশ দরিদ্র লোক তাদের জমির মালিকানা হারাচ্ছে এবং দারিদ্র রেখার নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ করে শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য এবং খাদ্য তালিকায় শর্করার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। নারী শিক্ষার

দিক থেকে এই চর এলাকার জনগোষ্ঠী খুবি পিছিয়ে এবং নারীর ক্ষমতায়নেও পিছিয়ে। কিন্তু বর্তমানে কিছু এন.জি.ও. ও বেসরকারী প্রতিষ্টানের সচেতনতামূলক কর্ম তৎপরতার কারণে নারীর ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের সনির্ভর কাজের যোগানের মাধ্যমে। সর্বোপরি যদিও পরিবর্তনের হার খুবই কম তবুও দেখা যাচ্ছে যে পরিবর্তন হচ্ছে।